কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

সন্দীপন দাসের লেখা

অর্থের এক্কা দোক্কা

অর্থের এক্কা দোক্কা। শব্দের মেহফিল।

খুব জোর বেঁচে যায় অবিরাম। হুড খোলা শব্দের জানা যায় না কেন অনুপ্রবেশ। পাশে এসেছে সোমবার শব্দের লোকটাক। আজ থেকে আড়িতে। কোথায় পালালো থেকে কথায় কথায় পালানো। অনেকে এসেছেন উঠোন ওঠা ঠোঁটে। বিরাম কবে থেকে সোমবার। শব্দ লোকটাকে ভাব করা। আসা যাওয়ার দানা গুল হতে পারে।

ভুলভুলাইয়া শব্দ শহরের। খ খুলে গায়ে গায়ে রাস্তা। বাড়িতে বাড়িতে ভুলের শরীর সারা রাত। গল্পের ছোট ছোট অন্ধকার দরজা চেয়ে। তারা পড়তে নদীর কুহু। ঘুরে আসছে শরীরের বিপরীত। খুঁজে পাওয়ার না পাওয়ার পাতাগুলোয় বিচার। ভাবে অভাবে চোরকে চুরি। দরজা খুলে বেনো পড়তে রাস্তার গণ্ডি। ঘর তুলে নিচ্ছে বদনামের এক রাস্তা আরেক ঘর।

অর্থের নয় ছয়। শব্দের সাড়া।

তিনি সরকার। জেগে আছেন ও ঘুমিয়ে আছেন। একটা একটা কোরে হৃৎপিণ্ড নেমে আসছে মাটিতে। ছড়ানো হৃৎপিণ্ড স্বর হোয়ে কঙ্কাল ভাঙা দুপুর। ঐ জঙ্গল পাশে দাঁড়িয়ে। ডেকে উঠল অন্ধকার। অন্ধকার সব্জির খেতে। গোড়ালি ডুবিয়ে ফটো বিকেল।

ফিরে যাচ্ছেন সন্ধ্যে সাতটার বাসে।

সব ঘটনা ঘটে গেলেও। ছাপ থাকলেও। অনিশ্চিত। মধুমালতী উড়ে ধুলোবালি। কাঞ্চন রোদে পুড়ে হাঁটে। প্রতিটা রাস্তায় একটা কোরে দোকান চেনা লাগে। ফিরতে পারে না শুধু ঘর। গামছা দিয়ে মুছে মঞ্চের আলোই মুখ। বেঁচে থাকা শেষ হোক। মুখোশের মুখ ফেরানো অন্য দিকে।

অর্থের সাত পাঁচ। শব্দের শরীর।

লাজারাস দিয়ে গেছিল অনেক দূর থেকে। বাবা কাজ করত যেখানে। তারা এসেছিল। মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সুন্দর কোরে সাজানো। রোজ সুগন্ধে ভরে যায় ঘর। শরীর। লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখে মাটির গন্ধ। অনেক ভালো এনেছে। অনেক সুর। ফুর্তিবাজ। পিয়ানোটা বাজিয়ে চলেছে। সাত বছর বয়স থেকে। মুখস্থ। এটা সিনেমায় একটা লোকের উক্তি। সেটাই দৃশ্য।

কে যেন দিয়েছিল মা-কে ছবিটা। সাজিয়ে রেখেছিল। ফুলের মালা দিয়ে। ধূপ-ধুনো দিয়ে। তারপর শুকিয়ে যাওয়া চামড়া। একটা ঘা ছড়িয়ে পড়ছে। শরীর থেকে ঘর। চোখ বুজে আসছে। দুর্গন্ধে সবাই দূরে। লেখো, একটা ধ্বনি লেখো। দাঁড়কাক বসে আছে। ফাঁকটা আসলে ছিলই। জেনে শুনেই অন্ধ।

লাজারাস যদি আসত এক জীবন থেকে আরেক জীবনে। গল্প করত। কাছে থাকত।

অন্ধরাই শুধু থাকে। অন্ধরাই চালায় শরীর।

অর্থ সাতে পাঁচে। শব্দের রাহাজানি।

লিলিপুট আর চুনোপুঁটি যখন তাদেরই চরাচর। প্রথম লাইন একটা সেলার। অথবা প্রথম লাইনটা সেলারে আছে। সেলার ছড়িয়ে আছে। ফোড়ন কাটে সেলার সময়ের ফাঁকে ফাঁকে। প্রথম লাইন ফিরে এসো মদে। প্রথম লাইন যা করবে সেলারে আছে। বা মদে
আছে।

এক ফোঁটা সম্মোহন গায়ে গায়ে। দুই থাকলেই একটা লাইনের শুরু। একটা গল্পের শুরু। এইভাবে প্রতিটা শব্দের জন্য আরেকটা শব্দ। ছবির জন্য আরেকটা ছবি। গল্পের জন্য আরেকটা।

দরজা ভাঙার পাশে পুকুরচোখ। পাশাপাশি স্বপ্ন আর আলু। সঙ্গে যোগ দিলো স্বপ্না, কানাভু, সুয়েনো, মুস্কায়। চারজন পথিয়ে, দুজন থেমে। চার ফুল আর এই দুনিয়া। যতটা শব্দানো সম্ভব শব্দিয়েছে। ফাঁকা রাস্তা কিছুটা মদানো, কিছুটা মিয়ানো।

সীমানায় না গেলেও সীমা ঘরেই আছে। যত্ন করে। ভয় দেখায়। সীমিত সংসার। সীমিত ক্ষমতা। এই কবিতাও সীমাবদ্ধ।

একটি চিত্রনাট্য প্রস্তাবনা

দৃশ্য ১

ফেড ইন

লাইব্রেরীর টেবিলে ছড়ানো ছিটানো বই, ম্যাগাজিন। কিছু খোলা, কিছু বন্ধ। মেয়েটা চেasয়ারে বসে পড়াশুনা করছে। পুরো শটটাই মিড শটে নেওয়া হবে। ক্যামেরা পুশ ইন করে আলমারির দিকে এগিয়ে যাবে। মেয়েটা ফ্রেমের বাইরে চলে যাওয়ার পর ভয়েস ওভারে মেয়েটার গলায় শোনা যাবে – "লাইব্রেরী মানেই শুধু অতীত। অতীত থেকে পাঠানো বার্তা। লেখা। প্রতিটা শব্দ। প্রতিটা বর্ণ। অতীতের। তবু আমার কাছে এসে পৌঁছায়। পড়ছি। বুঝছি। অনুভব করছি। কিন্তু আমার ভাবনাগুলো অতীতে পৌঁছাবে না। আমিও যা লিখব তা ভবিষ্যতের জন্য। তাতে কোনো আফশোস নেই। জীবনের মানেই তো তাই। জীবন সব সময় ভবিষ্যতের দিকে। এই জীবন রেখে যাচ্ছে পরবর্তী জীবনের জন্য। আবার সেই পরবর্তী জীবন আরেক জীবনের জন্য। এক জীবন থেকে আরেক জীবনে বার্তা। তথ্য। লেখা। গড়ে উঠছে লাইব্রেরী"

কথাগুলোর সঙ্গে স্ক্রিনের নীচে লেখাগুলো ফুটে উঠতে থাকে –

"চোখে আলো না পড়লে চোখ নিজেই আলো

ক্রমশ ধুলো আয়নায়

আয়নার সাঁতার

বীর্যপতনের পর যেমন

এই সরণি

চুলচেরা চলা"

ক্যামেরা সাইড ট্র্যাকে লাইব্রেরীর অন্ধকার গলিগুলো। পরে প্যান করে জানলার দিকে পুশ ইন করতে থাকে। ক্রমশ জানলার বাইরে চলে যায়। ক্যামেরা বাইরে চলে যাওয়ার পর ব্যাক গ্রাউন্ডে শোনা যায় –

"পিয়ালী, কখন এলে তুমি?"

"এই ঘন্টা খানেক হবে"

"যে বইটা আনবে বলেছিলে..."

"হ্যাঁ, এই তো"

ডিজল্ভ

দৃশ্য ২

একজন মধ্যবয়স্ক সুট পরা লোকের ছবির ক্লোজ আপ।

“লেখালেখি আর করি না। নিজের পুরানো লেখারও আর খবর রাখি না। চারপাশে কী হচ্ছে তার খবরও আর রাখতে ইচ্ছা করে না”

“কিন্তু আপনার যে খ্যাতি, জনপ্রিয়তা সেইসব ভেবেও লিখতে ইচ্ছে করে না? আপনার বই ‘স্বপ্ন যখন সময়’ এখনও আমরা পড়ি”

“এসব কিছু মনে পড়ে না। ধীরে ধীরে সবই মুছে যাচ্ছে। একটা বড় লেখার জন্য তৈরী করে নিচ্ছে”

ক্যামেরা এর মধ্যে ধীরে ধীরে জুম আউট করতে থাকে। লোকটার ছবি থেকে ক্রমশ স্টাডি টেবিল। বয়স্ক একজন চেয়ারে বসে। আরো জুম আউটে পাশের টুলে আগের দৃশ্যর মেয়েটা বসে। মেয়েটা টুল থেকে উঠে বইয়ের তাকের কাছে এগিয়ে যায়। ক্যামেরা তাকে ফলো করে।

“আপনার নিজের লেখা কোনো বই কি আপনার কাছে রাখেননি?”

“না। একবার লেখা প্রকাশিত হয়ে গেলে সে লেখায় লেখকের কোনো এক্তিয়ার থাকে না”

মেয়েটা একটা বই বার করে পড়তে থাকে। ক্যামেরা পিছিয়ে এসে মেয়েটাকে আর লোকটাকে একটা ফ্রেমের মধ্যে নেয়। লোকটা একটা কিছু লিখছে।

লোকটা বলতে থাকে, কিন্তু মনে হয় কথাগুলো অনেক দূর থেকে আসছে –

“আগে যা লিখেছি তাই যদি আবার লিখি তাহলে কি আমাকে আর সৃষ্টিশীল বলা যায়? আর অন্যের লেখাকে নিজের লেখা বলে চালালে সেটা টুকলি। এতদিন ধরে লিখলাম। এখন আর লিখতে পারি না। নিজের লেখা চিনতেও পারি না। যা যা লিখেছিলাম ভুলেও যাচ্ছি এক এক করে”

এই কথার মধ্যে ক্যামেরা প্যান ও টিল্ট আপ করতে থাকে। লোকটা ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। ফ্রেমে শুধু মেয়েটা থাকে। ধীরে ধীরে মেয়েটার মিড শট থেকে মিডিয়াম ক্লোজ আপ নিতে নিতে কাট করে।

একটা খাতায় ওপরের কথাগুলোই লেখা আছে। লেখাটা চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধু পাতার ঝিরিঝিরি শব্দ।

ডিসলভ

দৃশ্য ৩

ক্যাটালগ বক্সের ক্লোজ আপ। ক্যাটালগের খোপগুলো কয়েকটা খোলা। randomly। বাকিগুলো বন্ধ। সেগুলোর সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে। ক্যামেরা পুল আউট করে। মেয়েটা এসে ঢোকে। ঢুকেই লোকটাকে প্রণাম করে। লোকটা কিছুটা বিব্রত বোধ করে। একটু পিছিয়ে যায়। মেয়েটা উঠে বলে, "আমার একটা চাকরি হয়েছে, দাদা। অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার। বিহারের একটা মিশনারি কলেজে"

"বাহ্ খুবই ভালো খবর"

"মা যেতে দিতে চাইছে না। বাবাও একটু কনফিউজ্ড হয়ে আছে"

"বাবা-মাকে চিন্তা করতে বারণ করো। বাইরে যেতেই হবে। সুযোগ জীবনে সব সময় আসে না। সুযোগ কখনও হাত ছাড়া করো না"

"হুম। এগুলো খুলে রেখেছেন কেন?"

"দেখছিলাম"

"সবকটা একসঙ্গে!?"

"হ্যাঁ... না... মানে ভাবছিলাম"

"কী ভাবছিলেন?"

"এই ক্যাটালগগুলো আসলে মানচিত্র। অসংখ্য দ্বীপ দিয়ে তৈরী এক জগতের। ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ। এক একটা স্পেস-টাইম। বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের থেকে আলাদা। আবার আলাদা নয়"

"আর এই স্পেস-টাইমগুলোকে যদি টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়? যদি কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়?"

এই কথাবার্তা চলার মধ্যে ক্যামেরা পুল আউট করতে থাকে এবং কাট করলে দেখা যায় লম্বা টেবিলে ছড়ানো রয়েছে গাছের পাতা। ক্যামেরা তার ওপর দিয়ে horizontally যেতে থাকে।

"টুকরোগুলোকে জুড়ে দিলে আবার? টুকরোগুলোকে নতুন করে সাজাবো? নাকি তালগোল পাকিয়ে একটা মণ্ড বানাবো?"

"আর যে দ্বীপগুলো হারিয়ে গেছে? ভ্যানিশ হয়ে গেছে?"

"হারিয়ে যাওয়ার থেকেই নতুনগুলো আসবে। হারিয়ে যাওয়া আছে বলেই নতুন আছে"

কাট করলে দেখা যায় পাতার স্তূপে আগুন জ্বলছে। ফটফট করে পুড়ছে। ক্যামেরা পুশ ইন করে।

ভয়েস ওভারে (তৃতীয় ব্যক্তির) "বই আগেও পোড়ানো হয়েছে। আবারও পোড়ানো হবে"

লোকটার মেয়েটার কথাবার্তা চলতে থাকে –

"তাহলে হারালেও পুরোপুরি হারিয়ে যায় না!"

"হয়তো না। কিংবা কিছু হয়তো চিরকালের মতো হারায়"

ডিসলভ

দৃশ্য ৪

লম্বা ঘর। তার শেষ প্রান্তে আরামকেদারায় বসে আছে লোকটা। আরামাকেদারার ডানদিকে একটা ল্যাম্প স্ট্যান্ড। তাতে আলো জ্বলছে। ক্যামেরা পুশ ইন করে এগিয়ে যায় তার দিকে। খুবই ধীরে। হাতে বই। কী বই বোঝা যায় না। পড়তে কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়। মুখ শুকনো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দরজায় নক।

"খোলা আছে। চলে এসো"

বইটা আরামকেদারার হাতলে রেখে বলেন। দরজা খোলার শব্দ। জুতোর শব্দ এগিয়ে আসে। মেয়েটা কথা বলতে বলতে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে। "দাদা আপনার শরীর খারাপ কিছু বলেননি তো! শ্যামলদার কাছ থেকে জানতে পারলাম"

"বলার কী আছে!" সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মুখে অল্প যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। হেসে বলে, "এখন কেমন আছেন? জ্বর কমেছে?" কপালে হাত দিয়ে দেখে। "কী বই পড়ছেন? এখন বই পড়ার কী দরকার? শুধু শুধু শরীরের ওপর স্ট্রেস পড়ছে! আচ্ছা, আমি পড়ি; আপনি বরং চোখ বন্ধ করে শুনুন" "টুলটা নিয়ে এসো" মেয়েটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়।

[এই পুরো কথাবার্তার সময় ক্যামেরা লো অ্যাঙ্গেল থেকে মেয়েটাকে দেখায়। অর্থাৎ বৃদ্ধের বসে থাকা অবস্থার perspective থেকে]

পড়া শুরু হয়। ক্যামেরা প্যান করে বৃদ্ধের মুখের ওপর স্থির হয়। মেয়েটা যে পড়ছে এটা দৃশ্যতে দেখানো হবে না। শুধু কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

"এই যে কাঁথা সেলাই করছো, এর সুতো কোথায় পেলে? এই সুতো তোমারই আগের তৈরী কাঁথা থেকে নিয়েছ? নাকি অন্য কারোর কাঁথা থেকে নিয়েছ? একটা কাজ করো না কেন, তৈরী হওয়া কাঁথাগুলোর (সে তোমার তৈরী হোক বা অন্যের) সুতোগুলোয় চিহ্ন/দাগ দিয়ে রাখো। তাহলে নতুন কাঁথা যখন সেলাই করবে আর বুঝতে অসুবিধা হবে না এই সুতো কোন কাঁথার থেকে নেওয়া। অবশ্য তুমি তর্ক করবে, সুতো কোন কাঁথা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা কী জানা খুবই জরুরী? আর দাগ তো মুছে যাবে তখন তো কিছুই বোঝা যাবে না। অবান্তর এই কাজ। তার চেয়ে সেলাইটা বরং চলতে থাক। সুতো কখনও ফুরাবে না। যত সেলাই করবে সুতো ততই আসতে থাকবে"

আলো ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। ক্যামেরা পুশ ইন করতে থাকে। তারপর লোকটার ডান দিকটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোকটা সে দিকে তাকায় – "যে পাখিটা বসে আছে... গাছের ডালটায়... এবার উড়ে যাবে" কাট

করে পরের শটে এই কথাগুলোই খাতায় লেখা দেখা যায়। পরের কাটে এই দৃশ্যটাই দেখানো হয়। আবার পরের কাটে সম্পূর্ণ সাদা একটা পাতা(এটা বইয়ের মতো দেখতে হবে)। ভয়েস ওভারে(তৃতীয় ব্যক্তির গলা), "এই তিনটেই কি এক? এই শোনা। পড়া। দেখা। সব একটাই বার্তা দেয়?"

কাট

দৃশ্য ৫/ শেষ দৃশ্য

ভয়েস ওভারে মেয়েটার গলা – "দুটো মানুষের মধ্যে সম্পর্কটা কী তা কেমন করে জানবেন? সম্পর্কটা প্রেমের? স্নেহের? শ্রদ্ধার? বন্ধুত্বের? এতো সহজ? এতো সরলরৈখিক? কী হবে জেনে? সমাজ জানতে চায়। সমাজের প্রশ্নটা সরল। কোনো জটিলতা নেই। শুধু জানতে চায় সম্পর্কে শরীর আছে কি নেই? শারীরিক কি শারীরিক নয়? এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই সমাজ সন্তুষ্ট" [এই ভয়েস ওভার শটের শুরুতেই থাকবে না। কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে।]

একটা প্লেটে রাখা কিছু আপেলের টুকরো। পিঁপড়ে ঘুরে বেরাচ্ছে। এক্সট্রিম ক্লোজ আপ। জুম্ আউট করে প্লেটের পাশে একটা কাচের গ্লাস জল ভর্তি। জল গড়িয়ে পড়ছে গ্লাসের গা বেয়ে।

কাট করে এই প্লেট আর গ্লাসের ফটোগ্রাফ।

কাট করে প্লেট আর গ্লাসের পেন্টিং।

কাট করে শুকনো ডালপালা মেলা গাছে কিছু পাখি বসে।

সন্দীপন দাস ২১-১০ দশকের কবি ও কবিতাভাবুক। প্রযুক্তিকর্মের পাশাপাশি চিত্র, লিপি, কাব্যভাবনা ও কাব্য-ঐতিহ্যের নানাদিক নিয়ে ক্রমাগত ভেবে চলেছেন সন্দীপন। কৌরব অনলাইনে একটা ধারাবাহিক কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধও লিখছেন – তরুণ কবির কাব্যজিজ্ঞাসা। সে লেখায় অনেক পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা ও প্রশ্ন তুলে আনছেন যার সাথে আন্তঃক্রিয়ায় এসময়ের যেকোনো তরুণ কবিই লাভবান হবেন।